মানবজমিন

৭ নভেম্বর ২০১৮

আগামী নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হবে এমন চিত্র এখনো দেখা যাচ্ছে না। তবে এটা নির্ভর করছে সরকারের সদিচ্ছার ওপর। এমনটাই মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ । তিনি বলেছেন, সরকার যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে মিটিং-মিছিল ও জনসভা করতে না দেয়, ছাত্র সংগঠনগুলোকে বাধা দেয় এবং দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি চলতে থাকলে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হবে। তিনি বলেন, ১৯৯১ ও '৭০ সালের নির্বাচনী আবহ ও পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয়নি। সে জন্য আমি একটু শঙ্কিত। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে যথেষ্ট রাজনীতিকরণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কার্যালয়ে মানবজমিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক সংকটসহ নানা ইস্যুতে খোলামেলা আলোচনা করেন।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, এ অবস্থার পরও আমি মনে করি সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব। তবে আমি আশাবাদী ২০১৪ সালের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি হবে না।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনের কারণে আগামী নির্বাচনে একটি চাপ সৃষ্টি করবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা দেখেছি বিএনপিকে সরকারের পক্ষ থেকে নানামুখী চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে। এ অবস্থায় আমি মনে করি ঐক্যফ্রন্ট একটি ভালো উদ্যোগ। এর ফলে চাপ সৃষ্টি করবে যে একটি ভালো নির্বাচন হোক। সবার যদি অভিন্ন লক্ষ্য থাকে তাহলে সরকারও কিন্তু চাপের মুখে একটি ভালো নির্বাচন দিতে বাধ্য হবে।

স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের জনগণই সকল ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই প্রত্যেককে ভোটাধিকার দেয়া রাষ্ট্রের একটি পবিত্র দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সবাই নিজের ইচ্ছামতো ভোট দেবেন। কেউ কোনো বাধার সৃষ্টি করবে না। গণতন্ত্রের চর্চাটা কিন্তু নমিনেশন থেকে শুরু করে ভোট প্রদান পর্যন্ত থাকতে হবে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে মনে হয়েছিল উৎসবের একটি আমেজ। কেউ ভয় পায় নি। খোলা মনে সবাই ভোট দিয়েছে। এখন ভোট মানেই ভয়ের একটি ব্যাপার। দ্বিধা কাজ করে ভোট দিতে যাবো কি যাবো না? ১৯৭০ সালে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়ার ফলেই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ভোটাধিকার দেয়ার ফলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সবাই অবাধ ও স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রসঙ্গে প্রখ্যাত এই অর্থনীতিবিদ বলেন, বাংলাদেশের যে উন্নয়নগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখছি সেখানে প্রবৃদ্ধি ৬-এর বৃত্ত থেকে ৭-এ চলে এসেছে। রেমিটেন্স ও এক্সপোর্টসহ অন্যান্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি ভালো একটি অর্জন করেছি। সূচকের পরিমাণে আমরা ভালো একটি অবস্থানে আছি। কিন্তু এর পেছনের প্রকৃত উন্নয়নটা সর্বব্যাপী হয়েছে কি-না সেক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট দুর্বলতা রয়ে গেছে। উন্নয়নের প্রকৃত সুফল কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারি নি।

বেকারত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষার যে মান এবং ধরন এটা যদি চাহিদার সঙ্গে না মেলে তাহলে তো বেকারত্ব সৃষ্টি হবেই। কাজেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো বাস্তবমুখী করতে হবে। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ইন্টারেকশনটা খুবই কম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাদের মধ্যে একটি ইন্টারেকশন থাকে যে, তারা কি ধরনের শিক্ষা চায়। কি ধরনের লোক চায়। সে অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষিত করা হয়। এখন সময় এসেছে আমাদের দেশেও এটা করার। একই সঙ্গে দেশের শিক্ষার মানকে আরো নিশ্চিত করাটাও খুব জরুরি।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটাকে আলাদা করে দেখা যাবে না। অর্থাৎ উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র হচ্ছে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। অনেকেই অনেক সময় আর্গুমেন্ট করে বলে যে আগে উন্নয়ন হোক তার পরে গণতন্ত্র। এটা মোটেও ঠিক নয়। অমর্ত্য সেন তার বইতে লিখেছেন গণতন্ত্র ছেড়ে কেনো উন্নয়ন করবো? গণতন্ত্রের সঙ্গে উন্নয়নের একটি ফ্রেমওয়ার্ক থাকতে হবে। আর গণতন্ত্রের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। যেটা আমাদের এখানে নেই। এক্ষেত্রে পদে পদে দুর্নীতি হয়। দীর্ঘসূত্রতা থাকে। টেকসই উন্নয়ন হয় না। টেকসই উন্নয়নের জন্য চাই ধারাবাহিকতা।

গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। একটি সরকার উন্নয়ন করবে অন্যজন এসে বিল্ডার্প করবে। কিন্তু একনায়কতন্ত্র সরকার ব্যবস্থায় একজন উন্নয়ন করবে আরেক জন এসে বলবে- এটা ঠিক হয় নি। কাজেই দুটোই থাকতে হবে। শুধু উন্নয়ন থাকলে হবে না। সঙ্গে গণতন্ত্র থাকতে হবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সম্প্রচার নীতিমালা আইন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেকোনো ইস্যুতে সামাজিকভাবে তথ্যের আদান-প্রদান ও বাকস্বাধীনতার অধিকার অবাধ থাকতে হবে। এটা না থাকলে সামাজিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। তবে দেশ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে কিছু স্পর্শকাতর বিষয় প্রকাশ করা যাবে না। সম্প্রতি নতুন আইনের দোহাই দিয়ে বলা হয়েছে কোনো কিছু করা যাবে না, বলা যাবে না। এটা কিন্তু ঠিক না। এই আইনের মাধ্যমে কিছু লোককে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে- এতে করে ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে। যেকোনো পাওয়ার বা আইনের যেন অপব্যবহার না করা হয় সে জন্য ব্যালেন্স থাকতে হবে। তথ্য অধিকার আইন যদি অবাধ না থাকে সেখানে উন্নয়ন কিন্তু একপেশে হয়ে যায়। তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য থাকবে মানুষের স্বাভাবিক মূল্যবোধ বজায় রাখা। এবং রাষ্ট্র পরিপন্থি নয় ও জনস্বার্থ ব্যাহত করে এসব বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। অর্থাৎ সব জিনিস যখন সূর্য্যের আলোতে চলে আসবে তখন লোকজন সেসব বিষয়ে জানবে। প্রকাশ পাবে। এজন্য বলা হয় যে, ‘সান সাইন ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্টিসেপ্টিক’। কারণ অন্ধকারে থাকলে গুজব হবে। অপপ্রচার হবে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের শান্তিপূর্ণ উপায় সম্পর্কে তিনি বলেন, এখনকার রাজনীতি অনেকটা ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। রাজনীতিবিদদের একে অন্যের প্রতি এক ধরনের হিংসাত্মক মনোভাব থাকে। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি করে বলেই আজকে এই হাল। এখানে এত বেশি ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় যেটা উন্নত বিশ্বে দেখা যায় না। তিনি বলেন, আমার মনে হয় ক্ষমতা হস্তান্তর সমঝোতামূলক হওয়া উচিত। এবং রাজনীতিতে আরো ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে আসতে হবে। আমাদের দেশে রাজনীতি এবং ব্যবসা এই দুটোকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি আমরা। এ থেকে নিস্তার পেতে হলে রাজনৈতিক অঙ্গনে ভালো লোক ও শিক্ষিত লোক আসতে হবে। এই ধরনের লোকেরা আসলেই রাজনীতি তার স্বরূপ ফিরে পাবে।

কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের বিষয়ে ড. সালেহউদ্দিন বলেন, দুটি আন্দোলনই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও যুক্তিসঙ্গত আন্দোলন। নানা ধরনের অব্যবস্থাপনা থেকে এই আন্দোলন দুটো হয়েছে। আমি মনে করি তরুণদের মধ্যে সুশাসন ও ন্যায়ের বিষয়টি এখানে প্রজ্বলিত হয়েছে। ওরাই আমাদের পথ দেখিয়েছে। এবং এটাই সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের জন্য খুবই জরুরি। কারণ কোটার ফলে ভালো ও মেধাসম্পন্ন লোক আসতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রথমত মেধার ওপর জোর দেয়া এবং বিশেষ শ্রেণির জন্য কিছু কোটা বহাল রাখতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা ঠিক আছে। কিন্তু এটাকে নাতি-নাতনি পর্যন্ত টেনে নেয়াটা মনে হয় যুক্তিসঙ্গত নয়।
গায়েবি মামলার বিষয়ে তিনি বলেন, ফৌজদারি আইনে বলা হয়েছে- একজন ব্যক্তি যদি সাধারণ কোনো অন্যায় করে তাহলে তাকে সময় দিতে হবে। সিরিয়াস অপরাধ হলে ওয়ারেন্ট দেবে। কিন্তু এখন গায়েবি মামলার নামে হঠাৎ করে কাউকে চেনা নাই জানা নাই তার নামে মামলা দেয়া হচ্ছে। মৃত ব্যক্তি, প্রবাসী এমনকি বজ্রপাতেও মামলা হচ্ছে। এগুলো বেশিরভাগই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। এগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা উচিত।

সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে তিনি বলেন, সিভিল সোসাইটির কাজ হলো

সর্বজন স্বীকৃত কতগুলো অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারকে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করা। এখন সিভিল সোসাইটিগুলোর কিছু অংশ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির বিষয়ে তৎপর। এভাবেই সিভিল সোসাইটি কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে এখন সরকার সিভিল সোসাইটির ওপর সন্দেহ পোষণ করে। তারা সিভিল সোসাইটিকে দেখতে পারে না। সরকার ভাবে তারা আমাদের বিপক্ষে কাজ করছে। অথচ সিভিল সোসাইটি হচ্ছে সমাজের থার্ড আই বা তৃতীয় নয়ন। এই বিষয়টি সরকার তথা রাজনীতিবিদরা যদি উপলব্ধি করতে পারে তাহলেই তারা সফল। স্বাধীনতার ৪৭ বছরে সিভিল সোসাইটি অনেক ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে। যেটা গর্ব করার মতো। সিভিল সোসাইটির কাজ এবং গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু এখন কমে আসছে। অথচ তাদের অনেক কিছুই করার আছে।